নতুন দশকের প্রারম্ভে বাংলাদেশের অর্থনীতি

সাজ্জাদ জহির

সীমিত পরিসরের কারনে বিগত বছরের ঘটনাপ্রবাহের উপর দৃকপাত করবো না, বরং সরাসরি আগত বছরের কিছু সম্ভাবনা ও শঙ্কার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করবো। বিস্তৃত ব্যাখ্যায় না যেয়ে কিছুটা বিক্ষিপ্ত ভাবে বিষয়গুলো উপাস্থপন করবো – এসবের বিশদ যোগসূত্রতা খুঁজে বের করার দায়িত্ব পাঠকের হাতে ছেড়ে দিলাম। সে প্রয়াসকে সহজ করার উদ্দেশ্যে পরিসংখ্যান অনুপস্থিত।

খাদ্যদ্রব্যের বাজার দাম বৃদ্ধি সম্ভবত সবচাইতে আলোচিত বিষয়। আগামী মার্চ-এপ্রিল অবধি আন্তর্জাতিক বাজারে দাম উর্ধগতি থাকবে বলে অনেকেই মনে করেন। উপযুক্ত সময়ে বহিঃর্বিশ্ব থেকে পর্যাপ্ত সংগ্রহের অভাবে দেশের অভ্যন্তরে উভয় ব্যাক্তিখাত ও সরকারী মজুত ও সরবরাহে বিশৃংখলার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি শীতের মৌসুম প্রলম্বিত হয় এবং বোরো বীজতলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অভ্যন্তরীণ বাজারে সংকট বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কারণে সরকার খোলাবাজারে কম দামে চাল বিক্রয়ে উদ্যোগী হলে মজুত ও সরবরাহে ভারসাম্যহীনতা দেখা দিতে পারে, যা সাধারন বাজারকেও অস্থিতিশীল করতে পারে।

সার্বিকভাবে, উভয় আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বাজারে খাদ্যদ্রব্যের ও জ্বালানীর আপেক্ষিক দাম অদূর ভবিষ্যতে ঊর্ধমুখী থাকবে বলে ধারণা করা হয়। এধরণের প্রবণতা যদি আপেক্ষিক সরবরাহের প্রতিফলন হয়, জোর করে বাজার দাম নিম্নমাত্রায় বেঁধে রাখা উচিত কি? খাদ্যশষ্যের অধিক দাম সাধারণত জমির মালিককে উপকৃত করে – তবে, অতীত অভিজ্ঞতায় নিশ্চিত বলা যায় যে কৃষি-শ্রমিকের মজুরীও বৃদ্ধি পাবে এবং সাধারনভাবে, অক্ষম ও নির্দিষ্ট আয়ের ব্যাক্তি ছাড়া গ্রামীন জনসাধারণ উপকৃত হবে। বাজার দামের ঊর্ধগতি অতীতের মত শহুরে নির্দিষ্ট-আয়ের মধ্য ও নিম্ন-মধ্যবিত্তের জীবন-মানকে সংকটাপন্ন করবে। অনেকে তাই মনে করেন যে, দেশে উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়লে অনেক গরীব উপকৃত হবে, নিম্ন-আয়ের অনেকেই গরীব হবে, এবং সার্বিকভাবে অধিক মজুরীর কারণে শিল্পায়ন বিঘ্নিত হবে। এবং যদি দেশীয় পর্যায়ে অধিক দাম থেকে লাভ করবার জন্য স্থানীয় উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ না থাকে, জাতীয় সঞ্চয়ের বড় অংশ আমদানী করতে ব্যয় হবে।

অর্থনীতিক অগ্রগতির মূল চালিকা শক্তিঃ আমরা অনেককাল হাজারো জাতের দারিদ্র্য-বিমোচনের কথা বললেও সকলেই স্বীকার করবেন যে অর্থনীতিক অগ্রগতি ও ক্রমাগত আয়-মুখী সম্পদ-বৃদ্ধি ব্যতিরেকে স্থায়ী-ভিত্তিক দারিদ্র্য-বিমোচন সম্ভব নয়। একইসাথে উল্লেখ্য যে সকল অর্থনীতিক অগ্রগতিই স্থায়ীত্ব পায়না – অন্যান্য উপাদানের মাঝে প্রতিষ্ঠানিক পুঁজি, প্রযুক্তি ও বাজারের উপর নিয়ন্ত্রণ যা স্থানীয় বাজার বড় হলে সুগম হয়, এবং দেশজ-স্বার্থ চিহ্নিত ও এগিয়ে নেয়ার জন্য যোগ্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব স্থায়ী-ভিত্তিক অগ্রগতি আনার সহায়ক। বিগত দেড়-দু দশক জুড়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিক অগ্রগতির মূল ভিত্তি ছিল ক্রম-বর্ধমান শ্রম-রপ্তানী ও পোষাক/বুনন বস্ত্র রপ্তানী। একই সময়ে এন,জি,ও এবং ক্ষুদ্রঋণ-কর্মসূচী স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে এবং সেবা সরবরাহে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। আন্তর্জাতিক বলয়ের সাথে পেশাজীবিদের অধিকতর পরিচিতির কারণে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসারের ফলেও সেবা-ধর্মী খাতে অনেক উদ্ভাবনী উদ্যোগ লক্ষ করা গেছে। এসকল প্রক্রিয়ার মাঝ দিয়ে নিঃসন্দেহে এক বিশালাকার মানব-সম্পদ গড়ে উঠেছে, যা প্রতিষ্ঠানিকভাবে কাজে লাগিয়ে আমরা উত্তরোত্তর এগিয়ে যেতে পারি, অথবা যা উপযুক্তভাবে ব্যবহারে ব্যর্থ হয়ে আমরা অস্থিরতার পথকে সুগম করতে পারি। আমার ধারণায়, আগামী দশকের অর্থনীতিক অগ্রগতির ভিত্তিতে মৌলিক কিছু পরিবর্তন ঘটবে, যার পরিকল্পনা কেবল বাস্তবায়নের অপেক্ষায়। এ উন্নয়ন-চিন্তার সম্যক ধারণা ও সে চিন্তায় অধিকাংশের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার মাধ্যমে জাতির কল্যাণ ও স্থায়ী-ভিত্তিক অগ্রগতি নিশ্চিত সম্ভব।

প্রথমে লক্ষণীয় যে, রেমিটেন্স, অর্থাৎ বিদেশে কর্মরতদের পাঠানো অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির হার কমছে। বাইরে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৭ ভাগ কমেছে বলে শোনা যায়। পোষাক-রপ্তানী শিল্পে আগামীতে বিপরীতমুখী ধারার সংঘাত আরো বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের রপ্তানী-প্রবৃদ্ধি এতদিন টিকে ছিল মূলতঃ শ্রমের স্বল্প-দামের কারণে। সংকুচিত বিদেশের শ্রম-বাজার ও স্থানীয় পর্যায়ে শিল্পখাতে বিনিয়োগে স্থবিরতা একদিকে যেমন বেকারের সংখ্যা বাড়াবে, তেমনি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ভোগবাদী সংস্কৃতির প্রসার ও প্রক্ষেপিত উন্নয়ণ-ধারায় কিছু লোকের হাতে অধিক সম্পদ পুঞ্জিভূত হবার সম্ভাবনা, অধিক মজুরীর দাবিকে জোরদার করবে। সামষ্টিক অর্থনীতিতে এর সহজ সমাধান নেই — সেকারণে আগামী দশকের অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে পোষাক-খাতকে দেখতে আমার দ্বিধা।

সকলেই জানেন যে বিগত কয়েক বছর কিছু বৃহদাকারের ভৌত-অবকাঠামো গড়ে তোলার বিষয় আলোচনায় এসেছে — পদ্মা সেতু, গভীর সমুদ্র বন্দর, আঞ্চলিক যোগসূত্রতা বৃদ্ধির লক্ষে রাস্তা ও রেল-ব্যবস্থা, ঢাকা শহরকে বাসযোগ্য করে তোলা ও যানযট হ্রাসের উদ্দেশ্যে মেট্রো-ট্রাঞ্জিট (ঝুলন্ত সড়ক ও রেলপথ), এবং দ্রুত ইন্টারনেট-সংযোগের জন্য দেশজুড়ে ভূগর্ভস্থ অপটিক ফাইবার-এর নেট-ওয়ার্ক উল্লেখ্য। মাত্র দুদিন আগে সংবাদ-মাধ্যমে আরো জানা গেল যে মুন্সীগঞ্জ এলাকায় আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মান-কল্পে জমি অধিগ্রহণ হবে। ঘটনা-প্রবাহ পরিকল্পনার স্তর পেড়িয়ে যে বাস্তব-রুপ নিতে শুরু করেছে, তার নমুনা পাওয়া যায় বেশকিছু উদ্যোগে — পদ্মা সেতুর পরিকল্পনা স্তর পেড়িয়ে জমি অধিগ্রহণ শুরু, ভারতের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে রাস্তা ও রেল ব্যবস্থায় বিনিয়োগ, গভীর সমুদ্র-বন্দরের কারিগরী নিরুপণের কাজ শেষ এবং তা অর্থায়নের চেষ্টা চলছে, এবং শেষোক্ত দুটো কাজও শুরু হয়েছে বলে শোনা যায়। যদি পরিকল্পিত পথে সব এগুতে পারে, আসছে বছর থেকে শুরু করে আগামী দশক জুড়ে তাই অবকাঠামো নির্মানের কর্মযজ্ঞ চলবে। সেই সুবাদে এদেশে বৈদেশিক মূদ্রার প্রবাহ বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে, আর আসবে কারিগরী সহায়তার নামে বিদেশী পরামর্শক ও বাংলাদেশী-বংশোদ্ভূত বিদেশী নাগরিক। যেখানে এমন বিরাট আয়োজন চলে, সেখানে স্বল্পসময়ে দ্রুত লাভের আশায় অনেক সুযোগ-সন্ধানীর ভিড়ও জমবে। স্বল্পাকারে হলেও, এসবের প্রাথমিক প্রভাব দৃশ্যত হবার সম্ভাবনা রয়েছে ২০১১ সনেই।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কেন এই আয়োজন? সবকিছু একত্র করলে বিনিয়োগের পরিমাণ বিশাল — এবং তা থেকে প্রাপ্তির বিচারেই এর যৌক্তিকতা যাচাই সম্ভব। বিভিন্ন আলোচনায় দুটো সম্ভাব্য লাভের খাত উল্লেখ করা হয়। প্রথমত, ভারত ও পশ্চিমের সাথে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মাঝে বাণিজ্য প্রসারে এক নতুন যুগের সূচনায় ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের ভূমিকা। একইসাথে, নেপাল ও ভূটানের পণ্য-প্রবাহ থেকে প্রাপ্তিতে অংশীদারিত্ব পাওয়া। দ্বিতীয় লাভজনক খাতটি মূলত ভূগর্ভ থেকে (উত্ত-পূর্ব ভারত, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমুদ্রের তলদেশে) নঃনবায়নযোগ্য (নন্-রিনিউয়েবল) জ্বালানী সম্পদ উত্তোলন। তথ্যের দূর্লভতার কারণে এবিষয়ের আলোচনা অনুমান-ধর্মী হতে বাধ্য। তথাপি শেষোক্ত লক্ষেই বিশাল বিনিয়োগের মূল যৌক্তিকতা মনে হয়, এবং তাই প্রথমটি বাবদ কিছু পেলে তা হবে উপরি পাওয়া। বড় কোন অঘটন না হলে, সকলেই একমত হবেন যে আগত দশকে চীনের অগ্রগতি মূলতঃ এশিয়া অঞ্চলের বাণিজ্য প্রবাহের দিক ও গতি নির্নয় করবে। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে এব্যাপারে চীন মূলত দক্ষিণ-মুখী। সে পাকিস্তানে, শ্রীলংকায় ও মিয়ানমারে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মানে বিনিয়োগ করেছে; এবং লাও, ক্যাম্বোডিয়া ও মিয়ানমার ভূখন্ড দিয়ে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর রাস্তা নির্মানে চীন অধিক আগ্রহী। নেপালের মাধ্যমে স্থলপথে ভারতের বাজারে প্রবেশ চীনের জন্য অধিক সহজতর। এছাড়া, জলপথে ভারতের সাথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্য কম খরচের। সার্বিক বিচারে তাই জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ উত্তোলনের উদ্দেশ্যেই এই বিশাল বিনিয়োগের যথার্থতা পাওয়া সম্ভব। এ ধারণাটি আরো জোরালো হয়, যখন দেখি যে, বাণিজ্য-চাহিদা গুণতির ভিতর না এনেই গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মানের আয়োজন চলছে।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে আগামী বছর ও আসছে দশক বাংলাদেশের সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতি কেমন হবে, তার ভিন্ন একটি আঙ্গিক আলোচনায় আসে — সংক্ষিপ্তসারে সেটাতেই এনিবন্ধের সমাপ্তি টানা হবে।

অনুমানের খাতিরে ধরা যাক সকল পূর্ব-আয়োজন শেষ হয়েছে, বিভিন্ন দেশ, দল ও প্রতিষ্ঠানের মাঝে সমঝোতা হয়েছে, এবং ২০১১ সনের জানুয়ারী থেকে ওয়েল-রিগ বঙ্গোপসাগরে কাজ শুরু করল। সমুদ্র উত্তাল হবার আগেই যদি খনন-স্থান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়, উৎপাদন প্লাটফর্ম তৈরী করতে আরো দু'বছর, অর্থাৎ, ২০১২-১৩ তে উৎপাদন শুরু হবে এবং গভীর সমুদ্রবন্দরে উপযুক্ত প্লাটফর্ম তৈরী করে সেটা রপ্তানী হবে, না কি, কূলে প্লাটফর্ম তৈরী করে স্থলভূমিতে তা ব্যবহার করা হবে, সেটা দেখবার অপেক্ষা রাখে। সংবাদ মাধ্যমে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মানের পরিকল্পনা সম্পর্কে যা জানা যায়, তা থেকে মনে হয় ২০১৫ সনে সেই অধ্যায় শুরু হবে। অর্থাৎ, কি হবে সে ব্যাপারে অনিশ্চয়তা নেই, এখন তা বাস্তবায়নে কে পারদর্শীতা দেখাতে পারে সে প্রতিযোগীতাই মূখ্য। যারা এই বিশাল বিনিয়োগ করবেন, তারা স্বাভাবিক কারণেই বিনিয়োগের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাইবে, এবং বিলম্ব অথবা অযাচিত ঘটনায় অধিক খরচ করতে চাইবে না।

যদি কোনও কারণে এখনও সমঝোতায় পৌছানো সম্ভব না হয়ে থাকে, আগামী বছরে অস্থিরতা বাড়বে এবং অভ্যন্তরীণ খাতে বিনিয়োগের স্থবিরতা দীর্ঘায়িত হবে, যতদিন না এর মীমাংসা হচ্ছে। আমরা চাই বা না চাই, আমার ধারণা মতে, বাংলাদেশের জন্য সম্পদ আহরণের এক নবযুগের শুরু হতে যাচ্ছে। কিছুটা স্থূলভাবে বললে, এই প্রক্রিয়ায় এখানকার বাসিন্দারা মূলত দর্শকের ভূমিকায়। দুঃখ এই যে, যারা এখানে রাজার ভূমিকায় থাকবেন, তাদের অনেকেই আবার ভিনদেশে প্রজা হিসেবে অবনত। তারা কি পারবেন দর-কষাকষিতে আমাদের স্বার্থ রক্ষা করতে? ইচ্ছেমতো মানুষ যদি সীমান্ত পেড়িয়ে অন্যদেশে যেতে পারতো, 'ক্ষুদ্র' স্থানীয় স্বার্থের কথা বলতাম না। কিন্তু, আমাদের অনেককেই এবং আগামী প্রজন্মকে এই মাটি ও জলের সাথেই বেঁচে থাকতে হবে। তাই তাকে রক্ষা করা প্রয়োজন এবং ভূগর্ভস্থ সম্পদ থেকে প্রাপ্তি সর্বাধিক করে তার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরী। এর বিপরীতে, প্রচলিত ধারায় জনসাধারণকে দান-খয়রাতের বেড়াজালে আটকে রেখে এবং সাময়িক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির মাধ্যমে দৃষ্টি সরানোর চিরচারিত পথ বেছে নিলে জাতি হিসেবে দাঁড়ানো অসম্ভব হবে। পথটা পিচ্ছিল। বরং প্রয়োজন এসব আলোচনায় অধিককে সম্পৃক্ত করা, দক্ষিণাঞ্চলে পানির গুণগত মান নিশ্চিত করা, ভৌতকাঠামো গড়ার কাজে স্থানীয় শ্রমের অধিক কর্মসংস্থান, প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায্য দাম নির্ধারণে মেধার প্রয়োগ, এবং (সম্পদ) বিক্রী থেকে আয়ের উপযুক্ত বিনিয়োগ যেন নাইজেরিয়ার পরিণতি আমাদের না হয়। তাই আশা করবো যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রজ্ঞার পরিচয় দিবেন।